দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ...

# উপবৃত্তি কর্মসূচির প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করিতে হইবে

পৌর এলাকার বাহিরে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়ে শিক্ষার্থীদের বিনা বেতনে লেখাপড়ার বিধান থাকিলেও বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রেই তাহা মানা হইতেছে না। গত সোমবার এইরূপ সংবাদ ছাপা হইয়াছে দৈনিক ইত্তেফাকে। প্রকাশিত রিপোর্টে অভিযোগ করা হয় যে, নানান শর্ত জুড়িয়া দেওয়ায় গ্রামাঞ্চলের শতকরা ৩০ হইতে ৪০ ভাগ ছাত্রীই কেবল উপবৃত্তির সুবিধা ভোগ করিতে পারিতেছে। আবার যাহারা উপবৃত্তি পাইতেছে তাহাদের নিকট হইতে কৌশলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ টিউশন ফি আদায় করিয়া নেয় বলিয়া শোনা যায়। এই রিপোর্টে যে দুইটি সমস্যার কথা বলা হইয়াছে তাহার সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য নিবিড় অনুসন্ধান প্রয়োজন। তবে এই কথা ঠিক যে, উপবৃত্তি এবং মেয়ে শিক্ষার্থীদের বিনা বেতনে লেখাপড়া নিয়া গোড়া হইতেই চলিয়া আসিতেছে বিবিধ অনিয়ম। ফলে যে উদ্দেশ্যে উপবৃত্তি প্রদান করা হয় তাহা পূরণ হইতেছে না বহুক্ষেত্রে। পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র ও মেধাবী মেয়েদের জন্য শিক্ষার দুয়ার অবারিত করিয়া দেওয়ার মাধ্যমে নারী উন্নয়নই এই কর্মসূচির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। বাল্যবিবাহ রোধ করাও এই কর্মসূচির একটা উদ্দেশ্য। সে কারণেই উপবৃত্তি পাওয়ার জন্য অবিবাহিত হওয়ার শর্তটি জুড়িয়া দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গক্রমে এইখানে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় যে, ১৯৯৪ সালে সর্বপ্রথম দেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। উপবৃত্তিপ্রাপ্ত মেয়েদের টিউশন ফিও মওকুফের ঘোষণা দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর টিউশন ফি বাবদ সরকার নির্ধারিত অংকের টাকা স্কুল কর্তৃপক্ষকে পরিশোধ করেন। ইহার মানে হইল, কোনো স্কুল মেয়েদের বেতন মওকুফ করে না। এইরূপ সুবিধা পাওয়ার জন্য শতকরা ৭৫ দিন স্কুলে উপস্থিতি এবং প্রতিটি বিষয়ে ন্যূনতম ৪৫ পার্সেন্ট নম্বর পাওয়ার শর্ত দেওয়া হয়। উপরন্তু তাহাদের অবিবাহিত হইতে হইবে। ২০০২ সালে আসিয়া সরকার উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত উপবৃত্তি কর্মসূচি সম্প্রসারিত করেন। এইদিকে মহাজোটের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী সরকার স্নাতক পর্যন্ত মেয়েদের বিনা বেতনে লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু করিয়াছেন। পাশাপাশি এইবার উপবৃত্তি নীতিমালাতেও পরিবর্তন আনা হইয়াছে। এতদিন কেবল মেয়ে শিক্ষার্থীরাই উপবৃত্তির সুবিধা পাইয়া আসিতেছিল। এইবার শতকরা দশভাগ দরিদ্র ছেলে শিক্ষার্থীকেও এই কর্মসূচির আওতায় আনা হইবে। এখন হইতে উপবৃত্তির সুবিধা পাইবে গ্রামাঞ্চলের অতিদরিদ্র শ্রেণীর ছেলে-মেয়েরা। যাহাদের ৫০ শতাংশের কম জমি রহিয়াছে কিংবা যাহাদের অভিভাবকের বার্ষিক আয় ৩০ হাজার টাকার কম তাহারা এই সুবিধা পাইবার যোগ্য হইবে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা এই কর্মসূচির আওতায় পড়িবে। উল্লেখ্য, এই উপবৃত্তি কর্মসূচি পরিচালিত হইয়া থাকে বিশ্বব্যাংক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহযোগিতায়।

উপবৃত্তি কর্মসূচির মহতি উদ্দেশ্য সম্পর্কে কাহারো কোনো দ্বিমত করিবার অবকাশ নাই। ইহাও অনস্বীকার্য যে, উপবৃত্তি কর্মসূচি চালু হইবার পর বিগত পনের বৎসরে গ্রামাঞ্চলে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটিয়াছে উল্লেখযোগ্য হারে। এখন পল্লী এলাকার সব বাড়িতেই স্কুল-কলেজের মেয়ে শিক্ষার্থী রহিয়াছে। গ্রাজুয়েট মেয়ের সংখ্যাও গ্রামাঞ্চলে এখন কম নয়। বিভিন্ন এনজিও এবং মাঠ পর্যায়ে সরকারি কর্মীদের অধিকাংশই মহিলা এবং তাহারা গ্রামেরই বাসিন্দা। গ্রামেরই কোনো না কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করিয়াছে। নারী শিক্ষা প্রসারের ফলে পল্লী মেয়েরাও এখন কর্মমুখী। পরিবারের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাহারা অংশগ্রহণ করিতে পারিতেছেন। প্রসারিত হইয়াছে নারীর ক্ষমতায়নের জায়গাটা। গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনেও মেয়েরা রাখিয়া যাইতেছে অর্থপূর্ণ ভূমিকা। তারপরও একথা সত্য যে, উপবৃত্তির মাধ্যমে যতখানি সাফল্য অর্জিত হওয়া উচিত ছিলো, তাহা হয় নাই। শিক্ষার মানের উন্নয়ন ঘটে নাই। স্কুল-কলেজে মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়িলেও এখন পাবলিক পরীক্ষাসমূহে গ্রামের ছেলে-মেয়েরাই অধিকহারে অকৃতকার্য হইয়া থাকে। এই অকৃতকার্যদের এক বিরাট অংশ কিন্তু মহিলা। অন্যদিকে, নারী শিক্ষার প্রতি সবিশেষ জোর দিতে গিয়া পল্লীর দরিদ্র ঘরের ছেলে সন্তানরা অনেক ক্ষেত্রে পিছাইয়া পড়িয়াছে। উপবৃত্তির আশায় কোনো কোনো অভিভাবক মেয়েটিকে স্কুলে পাঠাইয়া ছেলেকে মাঠের কাজে লাগাইয়া দেয়। এই অবস্থাটিও কিন্তু কাম্য হইতে পারে না। এই পরিস্থিতিতে সরকার এইবার ১০ ভাগ দরিদ্র ছেলেদেরও উপবৃত্তি দিবার যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবসম্মত হইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি।

তবে উপবৃত্তি ব্যবস্থাপনাকে ত্রুটিমুক্ত না করিতে পারিলে নীতি বদলাইয়া প্রত্যাশিত সুফল পাওয়া যাইবে না। বলা বাহুল্য, উপবৃত্তি বন্টন-ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতির বহু অভিযোগ রহিয়াছে। একশ্রেণীর প্রকল্প কর্মকর্তা এবং শিক্ষকের যোগসাজশে নয়-ছয় হইয়া থাকে বলিয়া অতীতে পত্রপত্রিকায় অনেক রিপোর্ট ছাপা হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলে লেখাপড়ার মান নামিয়া যাইবার পশ্চাতে এইরূপ দুর্নীতি একটি বড় কারণ বলিয়া মনে করেন তথ্যাভিজ্ঞ মহল। এমতাবস্থায়, উপবৃত্তি বন্টন-ব্যবস্থাপনায় যাহাতে কোনোরূপ অনিয়ম না হইতে পারে, তাহা অবশ্যই নিশ্চিত করিতে হইবে। উপবৃত্তি পাইবার যোগ্য যাহারা তাহারাই যাহাতে উহা পাইতে পারে তাহার নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে। লেখাপড়ার মানের প্রশ্নটিকেও উপেক্ষা করা চলিবে না কোনো মতেই।